Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 162-174
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.094

মোহাম্মদ ঘুরীর রহস্যজনক আক্রমণ

হাবিবা সুলতানা, *স্বাধীন গবেষক, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

মহ: আজাহারউদ্দিন, *সহকারী শিক্ষক, পার্বতীপুর জুনিয়র বেসিক বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.04.2026; Accepted: 29.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The tenth and eleventh centuries North India were featured with emergence of small regional kingdoms. Beyond the north-west frontiers of India, in Central Asia, kingdoms and empires were rising to prominence under Islamic influence. In that process two kingdoms were prominent , viz Ghazna and other is Ghur and by the early 13th century they established their rule in North India in the vicinity of Delhi region .The Turks whether the Ghaznavids or Ghurids entered into India through the North Western mountain passes , attracted by India's well-watered plains with fertile soil, extending from the Punjab to the eastern borders of Bengal ,its rich and flourishing cities and parts ,and its fabulous wealth generated by the hard working peasants and skillful artisans , and experienced traders and financers. The Turks were Nomads and lived in areas now known as Mongolian and Sinkiang .Since the eighth century , they had been infiltrating into region called Mawara-un-nahar (Transoxiana) between the river of Amu(Oxus) and Syr , the Iranian rulers of the areas ,and the Abbasid caliphs ,brought in the Turks as mercenaries and slaves ,and recruited them as palace guards ,after converting them to Islam.After some time in the end of the ninth century when the Abbasid empire disintegrated and a series of expansionist states arose , independent in nature but giving natural suzerainty to the caliph and they legitimised their position by granting them a formal letter or Manshur. most of these sultans were Turks.

Keywords: Nur Jahan; Mughal Empire; Female Agency; Political authority; Economic influence

দশম শতাব্দীতে গজনভিদের উত্থানের মাধ্যমেই এই অধ্যায়ের সূচনা হয়। ৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানে সামানিদ শাসকদের সেনাপতি আলপ্তিগিন গজনীতে (৯৬৩-১১৮৬) স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন— যা বর্তমানে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। এরপর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তুর্কিদের চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ভারত বিদেশি আক্রমণের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। আলপ্তিগিনের স্থলাভিষিক্ত সুবুক্তিগিন (৯৭৭-৯৯৭) যুদ্ধকে হিন্দুশাহী রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে নিয়ে যান এবং আনুমানিক ৯৯০-৯৯১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুশাহী শাসকরা এক শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হন।

এরপর আসেন সেই সময়ের অন্যতম বিশিষ্ট শাসক সুলতান মাহমুদ (৯৭৭-১০৩০), যিনি দেশের বিভিন্ন মন্দিরে সঞ্চিত সম্পদ যতটা সম্ভব লুণ্ঠন করে নিজের ভাণ্ডারে জমা করার জন্য সুপরিচিত। ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি উত্তর ভারতে মোট সতেরোটি লুণ্ঠনমূলক অভিযান পরিচালনা করেন।

মূলত তিনি তাঁর পিতার নীতিই অনুসরণ করেছিলেন। রাভি নদীর ওপারে অবস্থিত কোনো অঞ্চলই তিনি নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বা দখল করেননি। বস্তুত, তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভারতের কোনো স্থানই ছিল না; তাঁর ভারতীয় অভিযানগুলো ছিল কেবল একটি তুর্কি-পারসিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম মাত্র। তবে তাঁর এই অভিযানগুলো ভারতকে বিদেশি আক্রমণের মুখে উন্মুক্ত করে দেয় এবং ভারতীয় শাসকশ্রেণির বিপুল বিত্তবৈভব ও অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে সবার সামনে নগ্নভাবে তুলে ধরে। পাঞ্জাব গজনভি সাম্রাজ্যের একটি অংশে পরিণত হয় এবং এর ফলে ভারতের বুকে মুসলিম শক্তির রাজনৈতিক সীমান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

গজনির মাহমুদ ভারতে একটি মুসলিম সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন; তাঁর অভিযানের একমাত্র স্থায়ী ফলাফল ছিল পাঞ্জাব অঞ্চলটি সাম্রাজ্যভুক্ত করা। পরবর্তীকালে মুহাম্মদ ঘোরির ওপরই সেই শাসক-ভিত্তি ও সমর্থন গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব বর্তায়, যা ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মুসলিম শক্তির আরও সম্প্রসারণ এবং একটি সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুইজ-উদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম— যিনি লোকমুখে শিহাবউদ্দিন মুহাম্মদ (১১৭৩-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ) নামে পরিচিত ছিলেন এবং যাঁকে 'ঘোরের মুহাম্মদ' বলেও অভিহিত করা হতো; তিনি গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবে খোয়ারিজমিদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রতাপের মোকাবিলা করার মতো সামর্থ্য ঘোরিদের ছিল না।

ঘুরি আক্রমণসমূহ (১১৭৫-১২০৬):

মুহাম্মদ ঘুরি ভারত আক্রমণ করেন এবং ভারতে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেন। এই কারণেই কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তাঁকে ভারতে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ১১৭৯ সালে তিনি পেশাওয়ারে পৌঁছান এবং সেটি দখল করে নেন। তাঁর আক্রমণের সময় পাঞ্জাব গজনভি বংশের শাসক খুসরু মালিকের শাসনাধীনে ছিল। খুসরু ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজা; তাই যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করা মুহাম্মদ ঘুরির পক্ষে সহজ ছিল না। এমতাবস্থায়, ১১৯২ সালে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে খুসরুকে হত্যা করেন এবং পাঞ্জাব দখল করে নেন। এরপর তিনি পৃথ্বীরাজ চৌহানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ রাজপুত রাজ্যগুলোর সামনে এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ান; কিন্তু সেখানে তিনি তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন, যা তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করে।

পৃথ্বীরাজ চৌহান— যিনি পৃথ্বীরাজ তৃতীয় নামেও পরিচিত— ছিলেন চাহমান বংশের সর্বশেষ এবং সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মহোবা, বুন্দেলখণ্ড এবং গুজরাটকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসেন। ১১৯১ ও ১১৯২ সালে সংঘটিত দুটি যুদ্ধে তিনি মুহাম্মদ ঘুরির আক্রমণকে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিহত করেছিলেন।

ধারণা করা হয় যে, জয়চন্দ্র যদি পৃথ্বীরাজকে সহায়তা করতেন, তবে এই যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হতো না। পৃথ্বীরাজ তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দিন আইবককে এই অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি মধ্য এশিয়ায় ফিরে যান, তবে ১২০৪ সালে পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে প্রমাণিত হয়। এটি তুর্কিদের উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। পরবর্তী বেশ কিছুদিন পর্যন্ত, ঘোরীয় শাসকরা বিজিত অঞ্চলসমূহের প্রশাসনিক দায়িত্ব তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়াকে সুবিধাজনক মনে করেননি। উদাহরণস্বরূপ, আজমীর অঞ্চলটি পৃথ্বীরাজের পুত্রকে একজন সামন্ত শাসক হিসেবে শাসন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে, ঘোরীয়দের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং রাজপুত শাসকদের মধ্যকার বারবার ও অন্তহীন সংঘাতের ফলে

এই ভঙ্গুর ভারসাম্য প্রায়শই বিঘ্নিত হতো। আইবকের নেতৃত্বে, তুর্কিরা সব দিকেই তাদের রাজ্যবিস্তার অব্যাহত রাখে। ১১৯২ সালের শেষের দিকে হাঁসি দুর্গটি পুনরায় সুদৃঢ় করার পর, আইবক যমুনা নদী অতিক্রম করে 'উচ্চ দোয়াব' অঞ্চলে একটি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন; ১১৯২ সালে মীরাট এবং বারান (যা বর্তমানে বুলন্দশহর নামে পরিচিত) অঞ্চল দুটি তুর্কিদের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১১৯৩ সালে দিল্লি অধিকৃত হয়। এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কারণে, ভারতে তুর্কি শক্তির রাজধানী হিসেবে এটিই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। এটি একদিকে যেমন পাঞ্জাবে অবস্থিত ঘোরীয়দের প্রধান শক্তিকেন্দ্রের সন্নিকটে ছিল, তেমনি অন্যদিকে পূর্বাঞ্চলে সামরিক অভিযান প্রেরণের জন্যও সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। এই সামরিক সাফল্য মুহাম্মদ ঘোরীকে ১১৯৪ সালে চান্দওয়ারের সন্নিকটে গাহাড়বাল বংশের রাজা জয়চন্দ্রের মুখোমুখি হতে উৎসাহিত করে। দীর্ঘ ও প্রলম্বিত এক যুদ্ধের পর জয়চন্দ্র শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন।

১১৯৫ সালের পর থেকে মুহাম্মদ ঘোরীর সামরিক অভিযানসমূহ ভারতের পূর্বাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলীয় এলাকাগুলোর দিকে নিবদ্ধ হয়। ঘোরীয়রা যেসব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— ১১৯৫-৯৬ সালে বায়ান, গোয়ালিয়র ও আনহিলওয়াড়া এবং ১১৯৭-৯৮ সালে বদায়ুন; এছাড়া আনুমানিক ১২০২ সালের দিকে কালিনজর ও মহোবা অঞ্চলও তাদের দখলে আসে। এই বিষয়ে প্রধান সূত্র হল

১) আল-বেরুনীর 'কিতাব-উল-হিন্দ'
২) মিনহাজ-ই-সিরাজের 'তাবাকাত-ই-নাসিরি'
৩) ফখর-ই-মুদাব্বিরের 'আদাবুল হারব'
৪) হাসান নিজামীর 'তাজ-উল-মাসির'

ঘুরিদের সাফল্যের নেপথ্যের কারণসমূহ:

ঘুরি বাহিনীর এই অভাবনীয় সাফল্যের ব্যাখ্যায় নানাবিধ কারণ তুলে ধরা হয়েছে। এই তত্ত্বগুলোর কোনো কোনোটি কেবল ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিরই প্রতিফলন মাত্র; ভারতে তুর্কিদের সাফল্যের যৌক্তিক ব্যাখ্যা হিসেবে এগুলোকে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। বিশেষত উত্তর ভারতের এবং সাধারণভাবে সমগ্র ভারতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এটি একটি অত্যন্ত বিতর্কিত প্রশ্ন। তুর্কিদের সাফল্যের বিষয়টি নিয়ে যে বিতর্কগুলো রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রশ্নটি হলো— ভারত কেন মাহমুদ গজনভির তরবারির কাছে, কিংবা মোহাম্মদ ঘোরির আক্রমণের মুখে এত সহজে নতি স্বীকার করেছিল বা এত সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল? এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে— আয়তন, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং রাজনৈতিক মর্যাদার বিচারে— ঘুর রাজ্যটি ভারতের অধিকাংশ রাজপুত রাজ্যের তুলনায় অনেক ছোট ছিল। সাহস ও আত্মত্যাগের মানসিকতার দিক থেকে রাজপুতরা কোনোভাবেই তুর্কিদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। রাজপুতদের বীরত্ব ও শৌর্যগাথা ছিল প্রবাদতুল্য। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অহিংস মনোভাবই তাদের পরাজয়ের কারণ— এমন দাবি সমসাময়িক রাজপুত রাজ্যগুলোর ইতিহাস দ্বারা সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয়ে যায়। যুদ্ধকে অবজ্ঞা করা তো দূরের কথা, বরং যুদ্ধই ছিল তাদের কাছে এক উন্মাদনার বিষয়; আর রাজপুত রাজ্যগুলো প্রতিনিয়ত একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত থাকত।

সমসাময়িক ইতিবৃত্তকারদের— যেমন হাসান নিজামী, মিনহাজ-উস-সিরাজ এবং ফখর-ই-মুদাব্বিরের— রচনায় ভারতে তুর্কিদের সাফল্যের কারণ সম্পর্কে কার্যত কিছুই বলা হয়নি। এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, তাঁদের দৃষ্টিতে তুর্কিদের সাফল্যের পেছনে কোনো রণকৌশল, যুদ্ধনীতি কিংবা অন্য কোনো সামরিক ব্যাখ্যার বিন্দুমাত্র প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। 'সর্বশক্তিমান আল্লাহই ইসলামকে বিজয় দান করেছেন'— কিংবা 'ভীম দেও-এর ছিল

বিশাল সেনাবাহিনী ও অসংখ্য হাতি; যখন যুদ্ধ শুরু হলো, তখন ইসলামের বাহিনী পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল'— এ ধরনের মন্তব্য বা উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত নগণ্য।

হাসান নিজামীর বক্তব্যগুলোও একইভাবে গতানুগতিক এবং কোনো কাজে আসে না। তুর্কিদের বিজয় সম্পর্কে ফখর-ই-মুদাব্বিরের বিবরণও একই ধাঁচের; তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর রচিত 'আদাবুল হারব' গ্রন্থটি কিছুটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক ব্যবস্থা:

ভারতীয়দের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ নিহিত ছিল তাদের সামাজিক ব্যবস্থা এবং বিদ্বেষমূলক জাতিভেদ প্রথার মধ্যে, যা সমগ্র সামরিক সংগঠনকে দুর্বল করে দিয়েছিল। জাতিগত বিধিনিষেধ ও বৈষম্য সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক—উভয় ক্ষেত্রেই একতার সমস্ত বোধকে নির্মূল করে দিয়েছিল। এমনকি ধর্মও ছিল সমাজের বিশেষ কিছু অংশের একচেটিয়া অধিকার; ভারতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ একনজর দেখারও সুযোগ দেওয়া হতো না। সুতরাং, ভারতীয় জনগণের বিশাল অংশের কাছে এমন কিছুই ছিল না যা ঘুরি (Ghurid) আক্রমণকারীদের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে তাদের মনে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে পারে। তারা এক ধরণের নিস্পৃহ ঔদাসীন্য নিয়ে ভারতীয় শাসকশ্রেণির ভাগ্য বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছিল। ফলে শহরগুলো পাকা ফলের মতোই সহজেই শত্রুর দখলে চলে গিয়েছিল। কেবল দুর্গগুলোই কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল; কিন্তু শত্রুপক্ষ যখন গ্রামাঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলল, তখন দুর্গগুলোও অসহায় হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় শাসকশ্রেণি যদি তাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় সাধারণ জনগণের সমর্থন লাভে সফল হতো, তবে এই দুর্গ ও গড়গুলো তাদের সমস্ত আক্রমণকারী বাহিনীকে একটি একক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে সংযুক্ত করে অত্যন্ত গতিশীল ও সুদৃঢ় এক প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হিসেবে কাজ করতে পারত। কিন্তু তৎকালীন বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতির কারণে, এই দুর্গগুলো শেষ পর্যন্ত এক ব্যর্থ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল এবং নিজেদের এলাকাটুকুও রক্ষা করতে পারেনি।

জাতিভেদ প্রথা রাজপুত রাজ্যগুলোর সামরিক দক্ষতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। যেহেতু যুদ্ধ করা ছিল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর পেশা, তাই সেনাবাহিনীতে নিয়োগ কেবল বিশেষ কিছু উপজাতি বা জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাকি সবাইকে সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত রাখা হতো। ফলে জনসংখ্যার বিশাল অংশই প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে হয় অদক্ষ ছিল, নয়তো অনিচ্ছুক। রাজপুত সৈন্যদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে নানাবিধ গুরুতর প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হতো, যা রণাঙ্গনে তাদের অবস্থানকে অত্যন্ত দুর্বল করে তুলেছিল। শারীরিক অপবিত্রতা বা 'অশুচিতা'র ধারণাটি সম্ভবত শ্রম বিভাজনকে কার্যত অসম্ভব করে তুলেছিল। একজন সৈন্যকে যেমন যুদ্ধ করতে হতো, তেমনি নিজের জন্য জল আনা, খাবার প্রস্তুত করা, নিজের বাসনপত্র ধোয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজও তাকেই করতে হতো— যে কাজগুলো মুসলিম শিবিরে সাধারণত অ-যোদ্ধা বা সেবাদানকারী গোষ্ঠীগুলো সম্পাদন করত। জাতিগত কঠোর বিধিনিষেধ এবং শারীরিক অপবিত্রতার ধারণা সৈন্যদের দ্রুত চলাচলের বিষয়টিকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল। রাজপুতরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অসীম ও বেপরোয়া সাহসিকতার জন্য সুপরিচিত হলেও, তারা কখনোই নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করতে পারেনি যে— "যুদ্ধে সবকিছুই মানসিক।"[i] একটি সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত সামরিক কৌশল— যেখানে শত্রুর হাতে পতন, ছোটখাটো বিপর্যয় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য পরিস্থিতি ও জরুরি অবস্থাগুলো বিবেচনায় রাখা হয়— রাজপুত যোদ্ধাদের কাছে খুব একটা অর্থবহ ছিল না; কারণ তারা কেবল বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতেই জানত, কিন্তু কীভাবে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়, তা তাদের জানা ছিল না। মোহাম্মদ হাবিব অভিমত প্রকাশ করেন যে, হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা হিন্দু রাজ্যগুলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা

দুর্বল করে তোলার ক্ষেত্রেও একটি ভূমিকা পালন করেছিল। যেহেতু খুব বেশি সংখ্যক জাতি বা গোষ্ঠী সামরিক পেশা গ্রহণ করেনি, তাই জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত ছিল। শারীরিক অপবিত্রতা বা 'ছুঁত'-এর ধারণাও সামরিক দক্ষতাকে ব্যাহত করেছিল; কারণ এই ধারণার ফলে সামরিক কর্মকাণ্ডে শ্রমবিভাজন বা কাজের সুষম বণ্টন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে আল-বিরুনির পর্যবেক্ষণগুলোর ওপর ভিত্তি করে মোহাম্মদ হাবিব এই মত পোষণ করেন যে, আক্রমণকারী ঘুরিদ বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার সময় হিন্দু শাসকদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুটি দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রথমত, জাতিভেদ প্রথা হিন্দু রাজ্যগুলোর সামরিক কার্যকারিতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এটি যুদ্ধে অংশগ্রহণের অধিকারকে কেবল যোদ্ধা জাতি বা 'ক্ষত্রিয়'দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত কঠোর নিয়মাবলির কারণে সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরেও সাধারণ বা কায়িক শ্রমসাধ্য কাজগুলো নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। জাতিভেদ প্রথার দ্বিতীয় অসুবিধাটি ছিল এই যে, এটি সমাজের অভ্যন্তরীণ সংহতি বা একাত্মতার ধারণাকে ক্ষুণ্ণ করেছিল। ইসলাম সাম্যের বাণী প্রচার করত; আর মোহাম্মদ হাবিবের মতে,

> "নগরবাসী সাধারণ মানুষ ইসলামের সেই মুক্তিদায়ক বা সাম্যবাদী বার্তার সাথে— যে সামাজিক শৃঙ্খল তাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল— তার একটি তুলনা বা বৈপরীত্য না টেনে পারেনি।"[ii]

কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামের দ্বারা সৃষ্ট অনন্য সামাজিক কাঠামোটি তুর্কিদের বিজয়ের পথ সুগম করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, যদুনাথ সরকার (J.N. Sarkar) ইসলামের তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথমত, এই ধর্মটি আইনি ও ধর্মীয় মর্যাদার ক্ষেত্রে পূর্ণ সাম্য এবং সামাজিক সংহতির ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছিল। ভারতীয়দের বিপরীতে, তুর্কি সমাজ কোনোভাবেই জাতিভেদ প্রথায় বিভক্ত বা স্তরবিন্যস্ত ছিল না। দ্বিতীয়ত, ইসলাম ঈশ্বর এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আস্থার শিক্ষা দিত; যা ধর্মপ্রাণ অনুসারীদের মনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা 'অভিযানের চেতনা' (sense of mission) জাগিয়ে তুলত। পরিশেষে, ইসলাম মদ্যপানের কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে; আর যদুনাথ সরকারের মতে, 'এই মদ্যপানের আসক্তিই রাজপুত, মারাঠা এবং ভারতের অন্যান্য বহু শাসকের পতনের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য আধুনিক যুগের অন্যান্য ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে এই যুক্তিটি খুব একটা সমর্থন লাভ করেনি'।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা:

ইতিহাসবিদদের মতে, তুর্কিদের সাফল্যের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ভারতীয়দের রাজনৈতিক দুর্বলতা। নিঃসন্দেহে, শাসকদের— কিংবা অন্তত উত্তর ভারতের শাসকদের— মধ্যে ঐক্যের অভাবই ছিল এই দুর্বলতার মূল কারণ। সুলতান মাহমুদের (৯৯৯-১০৩০) হিন্দুস্তানে অভিযানের পরবর্তী দেড় শতাব্দী জুড়ে আমরা দেখতে পাই রাজপুত রাজ্যগুলোর উত্থান, বর্ণপ্রথার তীব্রতা বৃদ্ধি এবং গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর তুর্কিদের ক্রমবর্ধমান চাপ। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এই শক্তিগুলোর ক্রিয়াকলাপের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই হিন্দুস্তানে ঘোরিদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। রাজপুত শাসনব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিল। আল-বিরুনির 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে 'রাজপুত' নামে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উল্লেখ আমরা পাই না। মনে করা হয় যে, আল-বিরুনির বর্ণিত 'ক্ষত্রিয়'রাই ধীরে ধীরে একটি তেজস্বী যোদ্ধা জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল; সামরিকতা ও শৌর্যবীর্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা পরবর্তীকালে 'রাজপুত' বা 'রাজপুত্র'—অর্থাৎ 'রাজবংশজাত সন্তান'— নামে পরিচিতি লাভ করে। তারা সুতলেজ নদী থেকে শুরু করে

শোন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘোরিদের মূলত যে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল, তা ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত। এই শক্তিগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল সাম্ভার ও আজমিরের চৌহানরা, মালবের পরমাররা, চেদির কলচুরিরা, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্লারা, গুজরাটের চালুক্যরা, কনৌজের গাহাড়বালরা এবং মগধের পালরা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত কার্যত এমন সব ছোট-বড় রাজ্যের সমষ্টিতে পরিণত হয়েছিল, যারা নিজেদের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে স্বাধীন ছিল। এ প্রসঙ্গে R. S. Sharma বলেন— "রাজনৈতিক বিভাজন এবং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ঘোরীর অগ্রগতিকে সহজ করে তুলেছিল।"[iii] পারস্পরিক ঈর্ষা এবং ক্ষমতা বিস্তারের নিরন্তর প্রচেষ্টা রাজ্যগুলোর সীমানায় ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে এমন এক গভীর ও দুরারোগ্য শত্রুতার জন্ম দিয়েছিল, যা দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য:

রাজপুত শাসনব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে ছিল পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক। প্রতিটি রাজ্যকে বিভিন্ন 'জাগির' বা সামন্ত-এলাকায় বিভক্ত করা হতো, যার দায়িত্ব বা মালিকানা ন্যস্ত থাকত শাসকবংশের (কুল বা গোত্র) সদস্যদের ওপর। এই সামন্তপ্রভুদের নিজস্ব সেনাবাহিনী পোষণের প্রথার কারণে তাদের নিজেদের মধ্যেই ব্যাপক হারে অন্তর্কোন্দল বা গৃহযুদ্ধ বেধে যেত—যা সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও বেশি বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল। Satish Chandra মত দেন— "রাজপুতদের পারস্পরিক সংঘাত তুর্কি আক্রমণকারীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।"[iv] তুর্কিরা যখন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়, তখন সামন্ততন্ত্র তার ইতিহাসের শেষ এবং নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সংকটময় ও অস্থিতিশীল পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল; আর সেই সময়েই 'উপ-সামন্তপ্রথা' বা 'সাব-ইনফিউডেশন'-এর চর্চা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অধিকাংশ বৃহৎ সামন্তপ্রভুরই নিজস্ব অনুগত সামন্ত বা অধীনস্থ শাসক ছিল— যেমন সামন্ত, ঠক্কুর ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রকূটদের নিজস্ব সামন্ত ছিল— যেমন গুজরাটের রাষ্ট্রকূট এবং শিলারগণ; আর এই সামন্তদেরও আবার নিজস্ব উপ-সামন্ত বা অধীনস্থ শাসকগোষ্ঠী ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি মূলত সেই সময়ের সামাজিক কাঠামোর মৌলিক দুর্বলতাকেই প্রতিফলিত করত।

উত্তর ভারতের প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র ও সমাজকে ডি.ডি. কোসাম্বি, আর.এস. শর্মা, ডি.এন. ঝা, বি.এন.এস. যাদব এবং আরও অনেক ঐতিহাসিকের দ্বারা 'ভারতীয় সামন্তবাদ'-এর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডি.ডি. কোসাম্বিই সর্বপ্রথম ভারতীয় সামন্তবাদের একটি তাত্ত্বিক বা ধারণাগত সংজ্ঞা প্রদান করেন; তিনি তাঁর আলোচনায় এমন দুটি বিষয় তুলে ধরেন যাকে তিনি 'উপর থেকে সামন্তবাদ' (feudalism from above) এবং 'নিচ থেকে সামন্তবাদ' (feudalism from below) হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর মতে, 'উপর থেকে সামন্তবাদ' বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায়, যেখানে রাজা তাঁর অধীনস্থ শাসকদের কাছ থেকে কর বা উপঢৌকন আদায় করতেন; আর সেই অধীনস্থ শাসকরা যতক্ষণ পর্যন্ত রাজাকে নিয়মিত কর প্রদান করে যেত, ততক্ষণ তারা নিজেদের অধিকারে বা স্বাধীনভাবেই নিজ নিজ অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করত। 'নিচ থেকে সামন্তবাদ' বলতে কোসাম্বি এমন একটি পর্যায়কে বুঝিয়েছেন, যেখানে— 'উপর থেকে সামন্তবাদ'-এর ক্ষেত্রে কর সরাসরি রাজকীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা সংগৃহীত হলেও— 'নিচ থেকে সামন্তবাদ'-এর ক্ষেত্রে কর আদায়ের কাজটি করত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধ্যস্বত্বভোগীরা; এবং তারা সংগৃহীত করের একটি অংশ সামন্ততান্ত্রিক স্তরবিন্যাসের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিত। আর.এস. শর্মা এই সময়কালটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এমন একটি যুগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা ছিল ক্রমাগত বিভাজন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের এক অবিরাম প্রক্রিয়ার সাক্ষী। এই বিভাজন ও বিকেন্দ্রীকরণের মূল কারণ ছিল সামন্তপ্রভু ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে

ব্যাপকভাবে জমি বা ভূসম্পত্তি বিতরণের প্রথা; এই জমিপ্রাপ্তরা সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডগুলোর ওপর নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ক্রমশ স্বাধীন ও ক্ষমতাধর শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রাজপুত রাজ্যগুলো নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল; এমনকি নিজেদের দেশের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ বা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধেও তারা ঐক্যবদ্ধ হতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। সেই সময়ের রাজনৈতিক দুর্বলতাগুলোর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাই ছিল সর্বাধিক প্রকট।

পরিশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, এই সময়কালটি ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ; এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অন্তহীন সংঘাত ও বিবাদ লেগেই থাকত। গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পর, উত্তর ভারতের কোনো একক রাষ্ট্রই আর প্রকৃত অর্থে সেই সাম্রাজ্যের স্থান বা মর্যাদা দখল করতে সক্ষম হয়নি। এর পরিবর্তে কানৌজে গাহাদবাল, মালবে পরমার, গুজরাটে চালুক্য, আজমিরে চৌহান, দিল্লিতে তোমর এবং বুন্দেলখণ্ডের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন শক্তির অস্তিত্ব ছিল। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘাত লেগেই থাকত এবং আলোচ্য সময়কালটি ছিল শান্তির স্পর্শবঞ্চিত। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অভাবও সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি ও কার্যকারিতা হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। ফখর-ই-মুদাব্বির তাঁর 'আদাবুল হারব ওয়া-আল শুজা'ত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'ভারতীয় বাহিনী মূলত "সামন্ততান্ত্রিক সৈন্যদল"[v] (Feudal levies) দ্বারা গঠিত ছিল। প্রতিটি সামরিক দল তাদের নিজ নিজ প্রত্যক্ষ অধিপতির (overlord) অধীনে পরিচালিত হতো, রাজার অধীনে নয়। ফলে, এই সেনাবাহিনীর মধ্যে 'আদেশের ঐক্য' বা 'unity of command'-এর অভাব পরিলক্ষিত হতো।

তুর্কিদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব:

গুপ্তযুগের সময় থেকেই ভারতের সামরিক ব্যবস্থা স্থবির হয়ে পড়েছিল। সামরিক সংগঠনটিতে যুদ্ধকৌশল, রণনীতি এবং অস্ত্রের ব্যবহারে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আলোচ্য সময়ে, প্রাচীন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাজপুতরা একটি প্রধান যোদ্ধা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ভারতে হর্ষবর্ধনই প্রথম ব্যক্তি যিনি সেনাবাহিনী সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন যে, হর্ষের সেনাবাহিনী চারটি বিভাগে বিভক্ত ছিল— পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, রথবাহিনী এবং হস্তীবাহিনী। K. A. Nizami মন্তব্য করেন— "ভারতীয় সেনাবাহিনীর অসংগঠিত কাঠামো এবং নেতৃত্বের অভাব পরাজয়ের একটি কারণ ছিল।"[vi]

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রুটিগুলো কে.এ. নিজামী স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন যে, রাজপুত সেনাবাহিনী মূলত "সামন্ত প্রভুদের দ্বারা সংগৃহীত সৈন্যদল নিয়ে গঠিত ছিল— যারা বিভিন্ন রাজপুত নেতার অধীনে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে এবং ভিন্ন ভিন্ন শর্তে প্রশিক্ষিত হতো; ফলে তাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের কোনো ঐক্য ছিল না এবং তারা কেবল ব্যক্তিগত খ্যাতির জন্যই যুদ্ধ করত।"[vii]

ভারতীয় সেনাবাহিনী মূলত তিনটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত ছিল— হস্তীবাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী এবং পদাতিক বাহিনী; এছাড়া নৌবাহিনী ছিল এই বিভাগগুলোর একটি অতিরিক্ত সংযোজন। পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানে উন্নত জাতের ঘোড়ার সহজলভ্যতার কারণে প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট রাজবংশগুলো একটি শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

ইসামি মনে করেন যে, তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রি.) ঘোরিদের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর অকার্যকারিতা, যারা হাতি দেখে ভীত হয়ে পড়ত। একারণেই শিহাব-উদ-দিন ঘোরি কুতুব-উদ-দিন আইবেককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন ঘোড়াগুলোকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে তারা হাতির

উপস্থিতি বা দৃশ্যপটে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। আর ঠিক এই কারণেই তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ঘোরিরা রাজপুতদের হাতে পরাজিত হয়েছিল।

অশ্বারোহী বাহিনী: ভারতীয় সেনাবাহিনীর অশ্বারোহী বাহিনী তাদের কাঙ্ক্ষিত সামরিক কার্যকারিতা থেকে বঞ্চিত ছিল। অন্যদিকে, ভারতে আগত তুর্কিরা তাদের যুদ্ধকৌশল ও রণনীতিগুলো অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল; কারণ তারা সৈন্যদের 'গতিশীলতা'র (mobility) ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিত, যা তাদের আক্রমণ করা, পশ্চাদপসরণ করা কিংবা শত্রুবাহিনীর কোনো নির্দিষ্ট অংশকে ঘিরে ফেলার ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করত। আলী আথার সারের লেখা "দিল্লি সালতানাতে সামরিক প্রযুক্তি ও যুদ্ধকৌশল" (Military Technology and Warfare in the Sultanate of Delhi) শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাই যে, তুর্কিরা মূলত তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর কারণেই যুদ্ধে সফল হয়েছিল। Peter Jackson উল্লেখ করেন— "ঘোরীর সাফল্যের মূল কারণ ছিল তার উন্নত সামরিক কৌশল এবং অশ্বারোহী বাহিনীর দক্ষতা।"[viii]

গতিশীলতা:

সেই সময়ে তুর্কি সামরিক সংগঠনের মূলমন্ত্রই ছিল 'গতিশীলতা'। সেটি ছিল অশ্বের যুগ; আর তাই প্রচণ্ড গতিশীলতাসম্পন্ন ও সুসজ্জিত একটি অশ্বারোহী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তাই ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। ভারতীয় সামরিক কৌশলে গতিশীলতার চেয়ে 'ভার' বা শক্তির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো। যুদ্ধবিগ্রহের অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য— গতিশীলতা বা ক্ষিপ্রতা (যার অন্তর্ভুক্ত ছিল আক্রমণের গতি, পশ্চাদপসরণের গতি, ধাওয়ার গতি ইত্যাদি)— রাজপুত রাজাদের সামরিক বিধিতে প্রায় অনুপস্থিত ছিল। যুদ্ধের হাতি ব্যবহারের ফলে সেনাবাহিনীর সেই সহজাত ক্ষিপ্রতা আরও হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলে তাদের বাহিনী সেই গতিশীলতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, যাকে মধ্য এশীয় শক্তিগুলো সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হিসেবে যথার্থভাবেই গণ্য করত। স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেন: "সীমান্তপারের এই আক্রমণকারীদের অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ববাহিনী তাদের ভারতীয়দের ওপর এক অখণ্ডনীয় সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিল। তাছাড়া, তাদের রসদপত্র বহন করত দ্রুতগামী উটেরা— যাদের জন্য আলাদা করে কোনো পশুখাদ্যের প্রয়োজন হতো না; বরং তারা পথের ধারের শিকড় ও লতাপাতা খেয়েই বেঁচে থাকত। পক্ষান্তরে, হিন্দু বাহিনীর রসদবাহী বানজারা বলদগুলো ছিল অত্যন্ত মন্থরগতি ও বোঝা-স্বরূপ।"

রণক্ষেত্রে দিল্লির সুলতানদের সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের মূলে ছিল তাদের সুচিন্তিত সামরিক কৌশল ও রণনীতি, যুদ্ধপদ্ধতি এবং উন্নতমানের অস্ত্রের ব্যবহার। সৈন্যদের সেই সামরিক গুণাবলি—যা নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল— তুর্কিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। তাই সৈন্যদের শারীরিক সক্ষমতা ও কর্মচঞ্চলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা যে কঠোর সামরিক অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত, তা বিশদভাবে পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। ফখর-ই-মুদাব্বির তাঁর গ্রন্থ 'আদাবুল হারব ওয়াশ শুজা 'আহ'-তে বিভিন্ন শারীরিক অনুশীলন এবং অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণের উল্লেখ করেছেন; যেমন— ভারোত্তোলন, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, গুলতি বা ফিতার সাহায্যে পাথর নিক্ষেপ, গদা চালনা, চক্র বা চাকতি নিক্ষেপ, অসিচালনা (ফেন্সিং) ইত্যাদি। পোলো খেলা এবং শিকার করাও তাদের সামরিক প্রশিক্ষণেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল।

তীরন্দাজি:

তুর্কি তীরন্দাজরা ধনুক থেকে লক্ষ্যভেদে অসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী ছিল। তারা অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার থাকা অবস্থাতেই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারত; এমনকি প্রয়োজনে ঘোড়ার পিঠের জিনের ওপর বসেই পেছন দিকে ঘুরে ধাওয়াকারী শত্রুদের লক্ষ্য করে সমান দক্ষতার সাথে তীর ছুড়তে সক্ষম ছিল।

হাসান নিজামী তাঁর 'তাজ-উল-মা'আছির' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "একজন দক্ষ তীরন্দাজ গভীর অন্ধকার রাতেও হাতির কপালে লাগানো আয়না লক্ষ্য করে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ছাড়াই তীর নিক্ষেপ করতে পারত।"[ix] ফখর-ই-মুদাব্বির আরও লিখেছেন যে, প্রতিটি সেনাবাহিনীতেই একজন 'হুকম-আন্দাজ' বা প্রধান তীরন্দাজ থাকত, যে যেকোনো লক্ষ্যবস্তুতে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারত। আন্দ্রে উইঙ্ক মন্তব্য করেন যে, "একজন দক্ষ তীরন্দাজ মিনিটে অন্তত ছয়টি লক্ষ্যভেদী তীর নিক্ষেপ করতে পারেন।"[x] 'আদাব-উল-হারব-ওয়া-শুজাআত' গ্রন্থে তীরন্দাজদের লক্ষ্যভেদের অনুশীলনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তীরন্দাজদের যে নির্দেশ দেওয়া হতো তা হলো— ধনুকটিকে হাতের মুঠোয় শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে; এরপর তর্জনী আঙুলটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখের ওপর কিংবা তীরের অগ্রভাগের ওপর স্থাপন করতে হবে। সামনের পা-টি অবশ্যই মাটিতে শক্ত ও স্থিরভাবে রাখতে হবে, পক্ষান্তরে অপর পা এবং হাতের আঙুলগুলো শিথিল রাখতে হবে। শরীরের ভঙ্গি হতে হবে ঋজু, মাথা থাকবে ঊর্ধ্বমুখী এবং কনুই থাকতে হবে সোজা। লক্ষ্য স্থির করতে হবে এক চোখ দিয়ে, অপর চোখটি অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে। উভয় হাত—

রকাব ও অশ্ব-খুরনাল:

তুর্কিদের সাফল্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল তাদের উন্নত সামরিক প্রযুক্তি— অর্থাৎ রকাব (stirrups) এবং অশ্ব-খুরনাল (horse-shoes)। তুর্কিরা লোহার রকাব ও খুরনাল ব্যবহার করত, যা তাদের আঘাত হানার ক্ষমতাকে জোরদার করত এবং তাদের অশ্বারোহী বাহিনীকে শক্তিশালী করে তুলত। তুর্কিরা ছিল 'অশ্বপতি'— অর্থাৎ অশ্বের অধিপতি। সমসাময়িক নথিপত্রে এর স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, দিল্লি সালতানাতের মুসলিম বিজেতাদের কাছে বিজয়ের সময়ই অশ্ব-খুরনাল বিদ্যমান ছিল; অথচ পারসিক ও মধ্য এশীয় তুর্কিরা—যাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী ছিল এই বিজেতারা— তারা এর কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই রকাব ব্যবহার করে আসছিল। হাবিব স্বীকার করেন যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকের ভারতীয় ভাস্কর্যগুলোতে প্রকৃত রকাবের চিত্র দেখা যায়; তবে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলিম বিজেতাদের মাধ্যমেই এটি ভারতে প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল।

সঠিক আকৃতির লোহার রকাব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে আবির্ভূত হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে তা ব্যাপকভাবে ইসলামি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর তুর্কি আক্রমণকারীরা যে রকাব ব্যবহার করত, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। ভারতে তাদের রকাব ব্যবহারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ফখর-ই-মুদাব্বিরের যুদ্ধকৌশল বিষয়ক একটি গ্রন্থে, যা ইলতুৎমিশের (১২১১-৩৬) রাজত্বকালে রচিত হয়েছিল। ফখর-ই-মুদাব্বিরের এই গ্রন্থে প্রদত্ত বিবরণ থেকে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, "ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতে অবস্থানরত তুর্কিরা তাদের ঘোড়ার খুরে লোহার পাত পেরেক দিয়ে আটকে দিত।"[xi]

নিযাহবাজি (বর্শা চালনা):

বর্শাধারীরা বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ করে তুলত, যার জন্য অশ্ব বা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করা আবশ্যক ছিল। শিহাব-উদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরি তারাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১) গোবিন্দ রায়ের ওপর বর্শা

দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন; গোবিন্দ রায় তখন একটি হাতির পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন। এই আক্রমণের ফলে গোবিন্দ রায়ের দাঁত ভেঙে তার মুখের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল।

কামান্দাজি (ফাঁস বা দড়ি নিক্ষেপ):

ফাঁস নিক্ষেপকারী বা 'কামান্দাজ'রা এতটাই দক্ষ ছিল যে, তারা দড়ি বা ফাঁস ছুড়ে একজন অশ্বারোহীকে কাবু করতে পারত এবং তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে ফেলে দিতে পারত। আল-জাহিজ একজন তুর্কিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: "সে একাধারে অশ্ব-পরিচারক, অশ্বারোহী, প্রশিক্ষক, অশ্ব-বিক্রেতা, পশুচিকিৎসক এবং দক্ষ চালক... একজন তুর্কির জীবনের শেষ প্রান্তে যদি তার অতিবাহিত দিনগুলোর হিসাব করা হয়, তবে দেখা যাবে যে— মাটির ওপর হেঁটে বা বসে সে যতটা সময় কাটিয়েছে, তার চেয়েও বেশি সময় সে কাটিয়েছে তার অশ্বের পিঠে বসে।" শিহাব-উদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরি অনুভব করেছিলেন যে, 'তরাইনের যুদ্ধে তাঁর সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মূল কারণ ছিল ঘোড়াগুলো—যারা হাতি দেখে ভীত হয়ে পড়েছিল; তাই তিনি আইবেককে ঘোড়াগুলোর প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন'।[xii]

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২) তুর্কিদের বিজয়ের পেছনে অন্যান্য কারণের পাশাপাশি, সৈন্যদের প্রদানকৃত এই বিশেষ প্রশিক্ষণও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এভাবেই সামরিক প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের সুবাদেই তুর্কিরা ভারতে তাদের সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

হালকা অস্ত্রশস্ত্র:

বিভিন্ন ধরণের ধনুক ব্যবহৃত হতো, যেমন— চাচি, খাওয়ারিজমি, লাহোরি, হিনভি, কোহি এবং কারোরি। এগুলোর মধ্যে 'চাচি' ধনুকটি ছিল অত্যন্ত কার্যকর এবং এশীয় তীরন্দাজদের কাছে এটি ছিল বিশেষ প্রিয়।

তরবারি: 'আদাব-উল-হারব' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন যে, কোনো সৈন্যের কাছে তরবারি ছাড়া অন্য সব অস্ত্র থাকলেও তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে সজ্জিত সৈন্য হিসেবে গণ্য করা হয় না। পক্ষান্তরে, যদি তার কাছে তরবারি থাকে— অন্যান্য অস্ত্র থাকুক বা না থাকুক— তবে তাকে কখনোই অস্ত্রহীন বা স্বল্প-সজ্জিত সৈন্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। দিল্লি সুলতানি আমলে বিভিন্ন ধরণের তরবারি ব্যবহৃত হতো, যেমন— রুমি, ফিরিঙ্গি, ইয়েমানি, চিনি, রুসি, সুলাইমানি, আলাই, কাশ্মীরি এবং হিন্দি। এগুলোর মধ্যে 'হিন্দি' তরবারিকেই সর্বোৎকৃষ্ট (গওহর-দারতার) হিসেবে গণ্য করা হতো। এই তরবারিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ও সেরা ছিল 'মৌজ-ই-দরিয়া'।

ভারতে রাজপুত সৈন্যরা 'পারালাক', 'তারওয়াতাহ' এবং 'রুহিনা' নামক তরবারিগুলো দিয়ে যুদ্ধ করতে অধিক পছন্দ করত; কারণ এই তরবারিগুলো ছিল অত্যন্ত শক্ত ও মজবুত এবং এগুলো দিয়ে আঘাত করলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হতো। ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরেকটি তরবারির নাম ছিল 'বাখারি'। 'কালাচুরি' নামক তরবারিটি ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত এবং এটি বিশেষ করে গজনভিদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এছাড়া 'খানজার' বা ছোরা-র মতো ছোট অস্ত্রশস্ত্রও ব্যবহৃত হতো, যা তুর্কি সৈন্যরা সম্মুখ বা হাতাহাতি যুদ্ধের (close combat) সময় সাথে রাখত।

বর্শা: বর্শা বা 'নেজা' আরব ও তুর্কিদের প্রধান অস্ত্র হিসেবে সুপরিচিত ছিল। এটি ছিল একটি হালকা অস্ত্র, যা পরিচালনা করা বা ব্যবহার করা বেশ সহজ ছিল। 'আদাব-উল-হারব' গ্রন্থের লেখক ভারতীয় বর্শাকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন, যা মূলত নলখাগড়া বা বেত দিয়ে তৈরি হতো। তিনি 'নেজা-ই-মর্দাগির' নামক একটি অত্যন্ত বিখ্যাত বর্শার কথাও উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় সৈন্যরা 'বাল্লাহ' নামক এক ধরণের ভারী বর্শা ব্যবহার করত। 'হারবাহ' (জান্দার) এবং রাজার অন্যান্য দেহরক্ষী বা নিরাপত্তা প্রহরীরাও বর্শা ব্যবহার করত। দিল্লি সুলতানদের সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন ধরণের বর্শা বিদ্যমান ছিল। 'শিল' ছিল এক ধরণের দীর্ঘ বর্শা। একই গোত্রের আরেকটি

বর্শা ছিল 'জোপিন', যা দৈর্ঘ্যে শিলের সমান হলেও ওজনে ছিল কিঞ্চিৎ ভারী। যোদ্ধারা জোপিন ব্যবহার করেই যুদ্ধ করতে অধিক পছন্দ করতেন; আর যদি এই বর্শা দিয়ে চালানো আক্রমণ ব্যর্থ হতো, তবে সৈন্যরা তলোয়ার হাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। আফগান ও ভারতীয় তলোয়ারবাজদের মধ্যে শিল ও জোপিনের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত প্রচলিত। পদাতিক সৈন্যরা 'নিমনেজা' ব্যবহার করত, যা ছিল এক ধরণের খাটো বর্শা। সুলতানের বিশিষ্ট পারিষদ ও সেবকরাও নিমনেজা দ্বারা সুসজ্জিত থাকতেন। হাতি আক্রমণের উদ্দেশ্যে 'পিলকুশ' নামক এক বিশেষ ধরণের বর্শা ব্যবহৃত হতো।

যুদ্ধ-কুঠার ও গদা— অশ্বারোহী সৈন্যরা সম্মুখযুদ্ধে বা হাতাহাতি লড়াইয়ে ব্যবহারের জন্য এই অস্ত্রগুলো সঙ্গে বহন করতেন। এই অস্ত্রগুলোর কার্যকারিতা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যুদ্ধ-কুঠার মূলত প্রতিপক্ষের বর্ম কেটে ফেলার কাজে ব্যবহৃত হতো; আর যদি এটি যথাযথভাবে চালনা করা যেত।

উপসংহার:

ভারতে ঘোরিদের সাফল্য কেবল একটি শাসকশ্রেণির স্থলে অন্য একটি শাসকশ্রেণির প্রতিস্থাপনকেই বোঝায়নি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, এটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ কিছু পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এটি সেই বহু-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত করেছিল, যা একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আদি তুর্কি সুলতানদের রাজনৈতিক আদর্শ ছিল এমন একটি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সংগঠন, যা অসীম ক্ষমতার অধিকারী একজন সম্রাটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সামন্ততন্ত্র— যার দুটি মৌলিক ধারণা ছিল প্রশাসনে আঞ্চলিকতা এবং সামন্ত প্রভুদের আইনি দায়মুক্তি— তা এই নতুন শাসনব্যবস্থার চেতনার সাথে খাপ খাচ্ছিল না; তাই এর বিলুপ্তির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাগুলো ভেঙে ফেলার এবং সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অংশগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় শক্তির সাথে সংযুক্ত করার হাতিয়ার হিসেবে 'ইক্তা' (Iqta) প্রথাকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

গত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতের 'রাই' বা রাজারা প্রায় প্রতি শীতকালেই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ হত্যার গৌরব এবং নিহত হওয়ার আনন্দটুকু বাদ দিলে, 'সম্পদের এই অবিরাম অপচয় ও রক্তক্ষয়ের' একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারত দেশের প্রশাসনিক ঐক্যসাধন। কিন্তু হর্ষবর্ধনের যুগের অবসানের পর উত্তর ভারতে কোনো ভারতীয় শাসকই দেশের প্রশাসনিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। আর এখন একদল বিদেশি মাত্র এক প্রজন্মের মধ্যেই এমন একটি কাজ সম্পন্ন করলেন, যা কোনো ভারতীয় শাসকের পাঁচ বা ছয় শতাব্দী আগেই করা উচিত ছিল। তাঁরা উত্তর ভারতের একেবারে কেন্দ্রস্থলে— এমন একটি অঞ্চলে যা তার জলবায়ুর জন্য খুব একটা প্রশংসিত নয়— দেশকে এমন একটি রাজধানী উপহার দিলেন যা একটি সুউচ্চ মিনার দ্বারা মহিমান্বিত। দিল্লি সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন নগর ও প্রধান বাণিজ্যপথগুলোকে নিয়ে আসার মাধ্যমে তাঁরা দেশকে একটি সর্বভারতীয় প্রশাসনের প্রাথমিক কাঠামোও প্রদান করলেন। ঘোরিদ ও তুর্কিদের সাফল্যের মূল সুবিধাটি নিহিত ছিল এই সত্যের মধ্যে যে (তাঁদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত মহান 'রাই' বা রাজাদের বিপরীতে), তাঁরা একটি সাম্রাজ্যিক প্রশাসনের মৌলিক শর্তাবলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য একটি সর্বভারতীয় সেবার ধারণাটি তৃতীয় পৃথ্বীরাজের পক্ষে তাঁর অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন করা কখনোই সম্ভব হতো না।

উত্তর ভারতে একটি কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের উত্থানের ফলে দেশের রাজনৈতিক দিগন্তে এক সুস্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রসারিত হলো এবং বিচ্ছিন্নতার গণ্ডিগুলো সংকুচিত হতে শুরু করল।

উত্তর ভারতে তুর্কি বিজয়ের আরেকটি দিক ছিল— যা অধ্যাপক হাবিবের ভাষায়— "নগর বিপ্লব"।[xiii] রাজপুত যুগের সেই পুরনো 'জাতি-ভিত্তিক নগরগুলো' সব ধরণের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো— উচ্চ ও নিম্নবর্গের মানুষ, শ্রমিক ও কারিগর, হিন্দু ও মুসলমান, এমনকি চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ— সবার জন্যই। তুর্কি সরকার সামাজিক বিভাজনের ভিত্তি হিসেবে কিংবা নাগরিক জীবনের মূলনীতি হিসেবে 'জাতি' বা বর্ণপ্রথাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করল। শ্রমজীবী শ্রেণি, সাধারণ শ্রমিক, কারিগর, বর্ণ-বহির্ভূত মানুষ এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণিগুলো নতুন নগর গড়ে তোলার কাজে নতুন সরকারের সাথে সানন্দে হাত মেলাল। বস্তুত, আদি তুর্কি সুলতানদের মূল শক্তির উৎস ছিল এই নগরগুলোই; কারণ এই নগরগুলোই তাদের শ্রমজীবী শ্রেণির উৎপাদিত সমগ্র উদ্বৃত্ত সম্পদ সরকারের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। Romila Thapar মত প্রকাশ করেন— "রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবই উত্তর ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছিল।"[xiv]

সামরিক ক্ষেত্রে তুর্কি আধিপত্যের প্রভাব ভারতীয় সেনাবাহিনীর চরিত্র ও গঠনশৈলীতে, এবং তাদের নিয়োগ ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তনে লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ করা আর কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার রইল না; বরং যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যুদ্ধের কঠোর ধকল সহ্য করতে সক্ষম—এমন সব সৈনিকের জন্যই সেনাবাহিনীতে নিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। এভাবেই এমন এক ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্ভব ঘটল, যেখানে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে সব উৎস থেকেই সামরিক প্রতিভাদের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। সামন্ততান্ত্রিক বাহিনীর (feudal levies) প্রথা বর্জন করে তার পরিবর্তে একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলার নীতি গ্রহণ করা হলো—যে সেনাবাহিনীর নিয়োগ, বেতন-ভাতা এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। একইভাবে, যুদ্ধকৌশলের ক্ষেত্রেও তুর্কিরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ভারতীয় সামরিক ব্যবস্থাকে মধ্য-এশিয়ার শক্তিগুলোর সমকক্ষ করে তুলল। পদাতিক 'পাইক' সৈন্যদের স্থলাভিষিক্ত হলো 'সাওয়ারান-ই-মুকাতালা' বা অশ্বারোহী যোদ্ধা বাহিনী; আর সামরিক সংগঠনের ভিত্তি হিসেবে ভারী বর্ম ও কেবল পেশিশক্তির ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে এখন প্রাধান্য পেতে শুরু করল সেনাবাহিনীর গতিশীলতা ও আঘাত হানার সক্ষমতা। বস্তুত, একমাত্র এই সুসংগঠিত বাহিনীই সফলভাবে দেশে মোঙ্গলদের আগ্রাসন প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

[i] বোনাপার্ট, নেপোলিয়ন। নেপোলিয়ন: উক্তি ও চিন্তাধারা। লন্ডন: ক্যাসেল, ১৯০১, পৃ. ২৩।

[ii] হাবিব, মোহাম্মদ। মধ্যযুগীয় ভারত। নয়াদিল্লি: ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৩, পৃ. ৫৮।

[iii] শর্মা, আর. এস. ভারতের প্রাচীন অতীত। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫, পৃ. ৩৪৫।

[iv] চন্দ্র, সতীশ। মধ্যযুগীয় ভারত। দিল্লি: হার-আনন্দ পাবলিকেশনস, ২০০৭, পৃ. ৯৮।

[v] ফখর-ই-মুদাব্বির, আদাবুল হারব ওয়া আল-শুজা'আত। (অনুবাদ সংস্করণ), পৃ. ৪২।

[vi] সাঙ, হিউয়েন। সি-ইউ-কি (পশ্চিম দেশের বৌদ্ধ বিবরণ), খণ্ড–১। পৃ. ২১০।

[vii] নিজামী, কে. এ. ভারতে ধর্ম ও রাজনীতির কিছু দিক। দিল্লি: আলিগড়, ১৯৬১, পৃ. ১১২।

[viii] নিজামী, কে. এ. ভারতে ধর্ম ও রাজনীতির কিছু দিক। দিল্লি: আলিগড়, ১৯৬১, পৃ. ১১৫।

[ix] পিটার, জ্যাকসন। The Delhi Sultanate: A Political and Military History. কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৯, পৃ. ৫৬।

[x] নিজামী, হাসান। তাজ-উল-মা'আছির, পৃ. ৭৬।

[xi] উইঙ্ক, আন্দ্রে। আল-হিন্দ: ইন্দো-ইসলামিক বিশ্বের নির্মাণ, খণ্ড–২। লাইডেন, ১৯৯৭, পৃ. ১৪০।

[xii] মুদাব্বির, ফখর-ই-, Adab-ul-Harb. (রকাব ও সামরিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত বর্ণনা), পৃ. ৪৮।

[xiii] মিনহাজ-ই-সিরাজ, Tabaqat-i-Nasiri. (ঘোরি ও দিল্লি সালতানাতের ইতিহাস), পৃ. ৬২।

[xiv] থাপার, রমিলা। প্রারম্ভিক ভারত। দিল্লি: পেঙ্গুইন, ২০০২, পৃ. ২৮৭।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. হাবিব, ইরফান। টেকনোলজি অ্যান্ড সোসাইটি ইন দ্য ১৩শ ও ১৪শ সেঞ্চুরিজ (১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে প্রযুক্তি ও সমাজ)। প্রসিডিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেস (ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কার্যবিবরণী), বারাণসী অধিবেশন, ১৯৭৯।

২. আথার, আলী। মিলিটারি হায়ারার্কি অ্যান্ড ডেজিগনেশনস ইন দ্য আর্মি অফ দ্য দিল্লি সুলতানস (দিল্লি সুলতানদের সেনাবাহিনীতে সামরিক পদক্রম ও পদবিসমূহ)। জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০০, খণ্ড XLII, সংখ্যা ১-২।

৩. আথার, আলী। এথনিক ক্যারেক্টার অফ দ্য আর্মি ডিউরিং দ্য সুলতানেট অফ দিল্লি (দিল্লি সুলতানি আমলে সেনাবাহিনীর জাতিগত চরিত্র)। মিডিইভ্যাল ইন্ডিয়া-২ (মধ্যযুগের ভারত-২), সম্পাদক: শাহাবুদ্দিন ইরাকি, মনোহর, নয়াদিল্লি, ২০০৮।